International peer Reviewed Journal
ISSN 2321-7340 Print
ISSN 2583-360X online
Lok-Utsa 5, Vol.-2: Issue-I: January 2023

মাটির সংস্কৃতির উৎস সন্ধানে—

লোক-উৎস

মুখ্য সম্পাদক
ড. পরিমল বর্মণ

মাথাভাঙ্গা * কুচবিহার

LOKA-UTSA 5
Vol: 2, Issue: 1
January, 2023
ISSN 2321-7340 for Print
ISSN 2583-360X For Online
Chief Editor : Dr. Parimal Barman

RNI Tittle Verified No:WBMUL00685
Language : Multiple Language
Annual Peer Reviewed Research Journal
on Arts & Literature and All Humanitics
Rs.299.00 for India, 5$ USD for others Country

স্বত্ব : সম্পাদক

প্রচ্ছদ ও অক্ষর বিন্যাস : দীপক বর্মণ, সূর্যদেব বর্মণ

প্রকাশক ও সম্পাদনা দপ্তর
ড. পরিমল বর্মণ
সংস্কৃতি ভবন, ওয়ার্ড নং-১১
পচাগড়, মাথাভাঙ্গা রোড
পো:-মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পিন-৭৩৬১৪৬
প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ২০২৩
মোঃ ৭৬০২১৩০৩০১/৮৯১৮৩৬৭৪৩৩
www.lokutsa.com
Email: chiefeditor@lokautsa.com

মুদ্রণ : শান্তি উদ্যোগ, সুকিয়া স্ট্রিট, কলকাতা

মূল্য : ২৯৯.০০ টাকা মাত্র

উত্তরঙ্গের রাজবংশী সমাজের সংস্কৃতির সন্ধানে

রমেশচন্দ্র বর্মণ
ইতিহাস বিভাগ
ঘাটাল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ :

উত্তরবঙ্গে ভূমিপুত্র হিসেবে পরিচিত জনগোষ্ঠী গুলি যেমন রাজবংশী, কোচ, মেচ, লেপঙা, ভুটিয়া, গারো, রাভা, তামাং, রাই, লিম্বু, লেপচা ইত্যাদি। এই জনজাতি গুলির জীবনধারার ধরণ, সমাজ, শৈলী, ধর্ম, ভাষা প্রত্যেকটির সঙ্গে প্রত্যেকটির স্বতন্ত্রতা লক্ষণীয়। সংস্কৃতি বলতে বোঝায় কোন অঞ্চলের মানুষের জীবনমুখিকর্মকাণ্ডকে, তাই সংস্কৃতি বহুমাত্রিক বা বহুবাচনিক ধরণাকে প্রকাশ করে। উত্তরবঙ্গের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী রাজবংশী সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্রতার বহিঃপ্রকাশের একমাত্র জায়গা হল তার নিজস্ব সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এই সম্প্রদায় তথাকথিত কর্তৃত্ববাদী বা বহিঃসংস্কৃতির মধ্যে নিজেদের নিমজ্জিত করে ফেলায় নিজেরা স্বাতন্ত্র্য হীনতায় ভুগছে। ফলস্বরূপ রাজবংশী সমাজ নিজেদের পুনরায় স্বমহিমায় প্রত্যাবর্তনের বা পরিচিতি নির্মাণের অন্যতম উপায় হল সংস্কৃতির পুনঃজীবন ঘটানো। উত্তরবঙ্গের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী রাজবংশী সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতির ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতির বিবর্তনের ধারা অনুসন্ধান করা এই নিবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

সূচকশব্দ : ভূমিপুত্র, রাজবংশী, জনজাতি, বহুমাত্রিক, স্বতন্ত্রতা, সংস্কৃতি, কর্তৃত্ববাদী, পুনঃজীবন, বিবর্তন।

সূচনা :

ঐতিহাসিকগত দিক থেকে বাংলায় উত্তরবঙ্গ এবং ইংরাজিতে নর্থ বেঙ্গল আলাদা প্রদেশ বা অঞ্চল নেই। কেননা ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, এমনকি পৌরাণিক দিক থেকেও উত্তরবঙ্গ নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু তারপরেও এই উল্লেখিত অঞ্চল প্রাচীনকাল থেকেই ঐতিহাসিক দিক থেকে সমৃদ্ধ এই অঞ্চলের মধ্যে পাল রাজ্য, গৌড় রাজ্য এবং মধ্যযুগের কামতারাজ্যের সগৌরব উপস্থিতি বর্তমান ছিল। উত্তরবঙ্গ নামের প্রথম আভাস পাওয়া যায় পঞ্চদশ শতকের কবি কৃত্তিবাস এর কবিতায়। তবে এখানে উত্তরবঙ্গ নামে নয় ছিল উত্তরদেশ।[১] প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার উত্তর দেশকে উত্তরবঙ্গ বলে অভিহিত করেছেন।

উপনিবেশিক শাসনের প্রয়োজনে ঔপনিবেশিক সরকার ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে রেলপথ নির্মাণের প্রয়োজনে যে রেল কোম্পানি গঠন করে তা নর্দান বেঙ্গল স্টেট Rail way গঠন করে। সরকারিভাবে প্রথম নর্দান বেঙ্গল কিন্তু নর্থ বেঙ্গল নয়। সরকারিভাবে নর্থ বেঙ্গল কথাটি প্রথম ব্যবহৃত হয় ব্রিটিশ সরকার দ্বারা গঠিত দুর্ভিক্ষ কমিশন রিপোর্টে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে। এরপর থেকে উপনিবেশিক সরকার ভৌগলিক ও প্রশাসনিক একক হিসেবে উত্তরবঙ্গের বা নর্থ বেঙ্গল এর অসংখ্যবার উল্লেখ করেছেন। বর্তমানে নিত্যদিনের কাজ কর্মের জীবনযাপনের উত্তরবঙ্গ নামটির বহুল ব্যবহার চোখে পড়ার মতো যেমন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা বা ইংরাজীতে নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন উত্তরবঙ্গ ট্রেনের নাম নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের নাম নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ ইত্যাদি যেগুলি সরকার দ্বারা পৃষ্ঠপোষক।[২] বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে দৈনিক সংবাদপত্র গুলির মধ্যে বর্তমান, আনন্দবাজার পত্রিকার পাতা উল্টালেই দেখা যায় উত্তরবঙ্গ শিরোনাম দিয়ে সংবাদ এছাড়াও উত্তরবঙ্গ সংবাদ নামে একটি দৈনিক পত্রিকা যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরের সাতটি জেলা নিয়ে আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, দুই দিনাজপুর যথা, দক্ষিণ দিনাজপুর ও উত্তর দিনাজপুর এবং মালদা উত্তরবঙ্গের প্রশাসনিক একক গঠিত যার কেন্দ্র হল উত্তর কন্যা। কিন্তু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডক্টর কুমার বর্মণ উত্তরবঙ্গের শাসনতান্ত্রিক একক এর থেকেও সাংস্কৃতিক উত্তরবঙ্গের ওপর জোর দিয়েছেন। এই সংস্কৃতি উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক পরিমণ্ডল হিসেবে উল্লেখ করেছেন, পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং বর্তমানে আলিপুরদুয়ার বাংলাদেশের রংপুর বিভাগ এবং নিম্ন আসামের কোকরাঝাড় বিলাসিপাড়া, চিরাং, বঙ্গাইগাঁও ধুবুরী ও গোয়ালপাড়া পর্যন্ত। এ অঞ্চলকে ডক্টর বর্মণ তিস্তা ব্রহ্মপুত্র ভ্যালি বা Basin হসেবে উল্লেখ করেছেন।[৩] উত্তরবঙ্গে কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, উত্র ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা জেলার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর রাজবংশী নৃতাত্বিক দিক থেকে রাজবংশী হিন্দু মঙ্গোলীয় জাতি অন্তর্ভুক্ত। কোচ রাজা বিশ্ব সিংয়ের সময় কোচরা হিন্দু ধর্ম গ্রহণের মধ্য দিয়ে রাজবংশীতে রূপান্তরিত হয় পরিণত হয়।

জৈবিক, মানসিক ও আত্মিক এই তিনটি বিষয় নিয়ে মানুষের পূর্ণতা, উত্তোরন ও পরিমার্জন-যার সমাহার হলো সংস্কৃতি। অক্সফোর্ড অভিধানে Culturele

শদটির অর্থ ''Improvement by mental or physical training''Ð[৪] সংস্কৃতি বলতে বোঝায় মানুষ তার জীবনের বহুবিচিত্র কর্মকাণ্ডকে সুতরাং সংস্কৃতির দ্বারা যেমন তার বাহ্যিক বিষয়গুলোকে সংজ্ঞায়িত করা হয় তেমনি, তার মননগত, নান্দনিক এবং সৃজনশীল বিষয়গুলি এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই প্রসঙ্গে সুনীতি চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বাঙালীর সংস্কৃতি' গ্রন্থে বলেছেন—''বাংলাদেশ বাংলাভাষী জনসমষ্টির মধ্যে দেশের জলবায়ু তার আনুষঙ্গিক ফলস্বরূপ দেশের উপযোগী বিশেষ জীবনযাত্রার পদ্ধতিকে অবলম্বন করে মুখ্যত প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতের ভাবধারায় পুষ্ট হয়ে বিগত সহস্রাধিক বছর ধরে যে মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তাকে বাঙালী সংস্কৃতি বলে''।[৫] ফোকলোর দ্বারা কোন অঞ্চলের মানব সম্প্রদায় পরম্পরাগত জ্ঞানলাভকেই বোঝায়। এর থেকেই একটি বিষয় পরিস্কার কোনো অঞ্চলের মানুষের সামগ্রিক জীবনযাত্রার প্রতিফলন হল সংস্কৃতি, কিন্তু সেই সংস্কৃতির ইতিহাস ওই সম্প্রদায়ের মানুষ রচনা না করে যদি কর্তৃত্ববাদী বা আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতাবাদী মদদপুষ্ট ধুরন্ধর ব্যক্তিদের দ্বারা করা হয়ে থাকে, তাহলে সংস্কৃতির অপব্যাখ্যা অবধারিত। অপরদিকে, প্রান্তিক সমাজের মানুষের সংস্কৃতি অবলুপ্তির প্রধান কারণ হল সেই সম্প্রদায়ের মানুষ, কেননা সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত মনানুষেরা পার্শ্ববর্তী প্রাগ্রসর সম্প্রদায়ের মানুষের সংস্কৃতিকে নিজের সংস্কৃতি বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। ভাল করে বলা যায় আনুকরনে মত্তহয়ে পরে, এম.এন. শ্রীনিবাসনের ভাষায় 'সংস্কৃতইজেশন'। এর অনিবার্য পরিণতি হলো সে তার শতাব্দী প্রাচীন একান্ত আপন বা অন্যভাবে বলা যায়, মানুষ তার ঐতিহ্যবাহী পূর্বসূরীদের বিশ্বাস, ধ্যানধারণা, আচার-আচারণকে স্মৃতির মণিকোঠায় স্থান দেয়, মানুষ তার ঐতিহ্যবাহী পূর্বসূরীদের বিশ্বাস, ধ্যানধারণা, আচার-আচারণকে স্মৃতির মণিকোঠায় স্থান দেয় অর্থাৎ তার নিজস্ব সংস্কৃতি, যা তার পরিচয়, সেটা সে ভুলতে বসে। বহু বাষাভাষী মানুষের উত্তরবঙ্গের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী রাজবংশী সম্প্রদায় ঠিক একইভাবে তার পরম্পরা ভুলতে বসেছে। ঐতিহাসিক সব্যসাচী ভট্টাচার্য কর্তৃত্ববাদী সমাজকে 'আয়ত' সমাজ এবং যে সমাজ তথাকথিত প্রগতিশীল সমাজ থেকে পিছিয়ে সেই সমাজকে 'অনায়ত' বা 'কণিক' সমাজ উল্লেখ করেছেন।[৬] উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায় যে এই কণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে পড়ে। 'কিরাত ভূমির' ইন্দো মঙ্গলয়েড শাখার মানুষ এবং সংখ্যার নিরিখে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী, রাজবংশীদের প্রায় অবলুপ্ত সংস্কৃতি গুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে; যথা পারিবারিক সংস্কৃতি, সামাজিক সংস্কৃতি

এবং কৃষিকেন্দ্রিক সংস্কৃতি।

কৃষিকেন্দ্রিক সংস্কৃতি :

আধুনিক সাহিত্যের পরিভাষায় আপেক্ষাকৃত কম উন্নত বা যে সমস্ত সম্প্রদায় উন্নতির আলো থেকে অনেকটা দূরে থেকে গেছে, সেই সমস্ত সমাজকে উন্নত সমাজের প্রতিনিধিরা প্রান্তিক জাতি উপজাতি ইত্যাদি অভিধায় আখ্যায়িত করার চেষ্টা করে। কিন্তু এক্ষেত্রে একটি বিষয় খুব মনে রাখা জরুরী যে পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের মানুষেরা নিজেরা কিন্তু এই অভিধায় সন্তুষ্ট নয় বা এই ধরনের সুবিধা বহন করতে চায় না। আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারা পরিচালিত সমাজ ওই সংশ্লিষ্ট সমাজকে 'Anti-modern' হিসেবে প্রায় অবহেলা, ঘৃণার পাত্রে রূপান্তরিত করে। বিষয়টি খুবই পরিষ্কার যে আধুনিকতার সঙ্গে প্রযুক্তিবিদ্যার বিবর্তন উত্তরণ নির্ভর করে সমাজের সংশ্লিষ্ট মানুষের বোধগম্যতার, সোজা ভাষায় বললে বোঝায় কতটা সে বুঝবে এবং প্রয়োগ করতে পেরেছেন তার উপর।[৭] আলোচ্য রাজবংশী সম্প্রদায়ের প্রযুক্তিবিদ্যা বা তাদের উদ্ভাবনী শক্তি বিংশ শতক পর্যন্ত আদিমস্তরে বা সেকালে পদ্ধতিতেই পরিচালিত হয়েছিল, এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। তাই প্রযুক্তি বিদ্যার দিক থেকে পিছিয়ে পড়া ব্রহ্মপুত্র-তিস্তা সমভূমির রাজবংশী সম্প্রদায় প্রকৃতি থেকেই তার প্রযুক্তির উপকরণগুলি সংগ্রহ করত এবং তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনে সেগুলো প্রয়োগও করত। পরিমল বর্মণ তার গবেষনামূলক গ্রন্থ 'উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের লোকপ্রযুক্তি' রাজবংশীদের প্রযুক্তিবিদ্যাকে 'লোকপ্রযুক্তি' বলে অভিহিত করেছেন এবং প্রাঞ্জল ব্যাখ্যাও দিয়েছেন।[৮] রাজবংশী সমাজের লোকপ্রযুক্তিগুলির মধ্যে যেগুলি প্রায় বিলুপ্তির পথে—তোলা, বেদা, বানা এছাড়াও অনেক রয়েছে, আমি আলোচনাকে সংক্ষিপ্তকরণ এর জন্যই এই তিনটি লোকপ্রযুক্তিকে বেছে নিয়েছি। লোক প্রযুক্তিগুলির প্রধান উপকরণ হল বাঁশ। Captain Lewin বলেছেন–"Bamboo grow extensively all over the country. and from the fuel supply of the people, besides being used lergely in the building of their houses, fences, etc"[৯] কোচবিহার রাজ্যের (স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গের জেলা) অর্থকারী ফসল, যা সাধারণত এই জেলার পূর্বে উৎপাদিত হয়ে থাকে। তামাক চাষে জলসেচের কাজে ব্যবহৃত হয় বাঁশের সবেক প্রযুক্তি তোলা। চাষিরা তামাক ক্ষেতের পাশে মাটি খনন করে যতক্ষণ না জলের স্তর পাওয়া যাচ্ছে তবে পুকুর খাল বিল বা নদীতীর হলে সেখানে আর কূপ খননের প্রয়োজন পড়ে না।

আর সেই জল উপরে তোমার পদ্ধতিকেই 'তোলা' বলে। শক্তপোক্ত বাঁশের আগ্রভাগে মাটিতে জলের উৎস থেকে কিছুটা দূরে পুঁতে রেখে সেই বাঁশের অগ্রভাগ সরু বাঁশ (মাকলা) বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় এবং সরু বাঁশের নিচের দিকে বালতি বাঁধা হয় এবং এই বালতির সাহায্যেই জল তোলা হয়।[১০] জল তোলাবার এই প্রক্রিয়াটিকে বালতিটিকে জলে নামানোর জন্য দৈহিক শ্রম লাগলেও জলভর্তি 'তোলার' যান্ত্রিক সুবিধা কে কাজে লাগিয়ে সহজে জল তোলা হয়, ফলে পরিচয় অনেক বেশি লাঘব করা যায়। 'তোলা'র ব্যবহার এর প্রাচুর্য কত বেশি ছিল তা আন্দাজ করা যায় তামাক উৎপাদনের পরিমাণ থেকে। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে কোচবিহার রাজ্য রপ্তানি করেছিল ৩৩.৯৪০ মণ।[১১] অন্যদিকে আপাদমস্তক কৃষি সম্প্রদায় রাজবংশী সমাজ বছরে দুবার ধার উৎপাদন করত। বিতিরি এবং আমন ধান। বিতিরি ধানে নিরানির কাজে 'বেদা' ব্যবহার করা হয়, সম্পূর্ণরূপে লো প্রযুক্তির ফসল। হাটনার তার 'বেঙ্গল স্ট্যাটিস্টিকাল রিপোর্ট' বেদার কথা উল্লেখ করেছেন। এই প্রযুক্তির ক্ষুদ্র সংস্করণ হলো 'হাচিচনি' খেতের জমিতে আগাছা পরিষ্কার করতে খুবই উপযোগী একটি প্রযুক্তি। কৃষি অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত রাজবংশী সম্প্রদায়েরমানুষ প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করে প্রাকৃতিক জলাশয়, খাল বিল এবং নদীর মাছ ধরে। মাছ ধরার ক্ষেত্রে যে লোক প্রযুক্তিটি ব্যবহার করা হতো তা হল 'বানা'। বানা তৈরি হতো সাধারণত বাঁশ ফালি করে সরু কাঠি তৈরি করা হত এবং এই কাঠি গুলিকে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে বেঁধে বানা তৈরি করা হতো। বানা দিয়ে জানের সাহায্যে মাছ ধরা হতো।

'যায় না ছাড়ে জানের পাছ
তাই খায় জানের মাছ'.....প্রচলিত প্রবাদ।[১২]

সামাজিক লোকাচার :

কৃষিকেন্দ্রিক রাজবংশী সম্প্রদায়ের কাছে পৌষ মাস শান্তির, সমৃদ্ধির মাস। শান্তি এই কারণে যে সে বিগত কয়েক মাসের ফসল 'ডালি ভর্তি' বা গোলাজাত করবে। এই সময় সে ফসল ঘরে তোলার কাজে ভীষণরকম ব্যস্ত থাকে। এ জন্য সে তারাতারি সোনালী ফসল ঘরে তোমার জন্য এই সময় 'হাইয়ালি' নিত। 'হাওয়ালি' হল মজুরির পরিবর্তে অনেকে মিলে একসঙ্গে কাজের পর রাতের দিকে মাংস ভাত খাওয়ার প্রথা। সাধারণত স্থানীয় হাটের দিন বা কাছাকাছি কোন একটা দিন 'হাওয়ালি' নেওয়ার চল দেখা যায়। আবার কাজের চাপ বেশী হলে হাওয়ালী হিসেবে রাতকে বেছে নেওয়া হয়, তবে সেটি জোৎস্নারাত হতে হবে। অন্যদিকে

ফসল ঘরে ওঠার পর কাজ কমে গ্রামগঞ্জে আয়োজন হয় কুশান, লোকনাট্য ও দোতরাপালা, সারারাত ধরে কেরোসিন তেলে হ্যাজাক বা লন্ঠনের টিম টিম এর আলোয় চলে বিচিত্র রকমের যাত্রা অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মন জুড়ানো অভিনয়। ঋতুতে রাজবংশী সম্প্রদায় এর ছেলেরা আগে থাকে পরকল্পনা করে পৌষ সংক্রান্তি রাত্রে কিছুটা দূরে হই হট্টগোলের মাধ্যমে বনভোজনে মেতে উঠে। বনভোজনের মাংস বাদ দিলে প্রায় সমস্ত কিছুই আশেপাশের ক্ষেতের আলু, বেগুন, মূলো সবার হওয়ার যথেষ্ট সম্ভবনা ছিল। বাচ্চাদের আনন্দ এবং তাদের কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে ভড়রা ভালো রকমের অবহিত ছিল কিন্তু তারা জেনেও না জানার ভান করে থাকতো। [১৩] কৃষিকেন্দ্রিক সম্প্রদায় রাজবংশীদের সমাজবদ্ধ লোকাচারের অনন্য নজির হল হুদুম দেও বা হুদুমা খেলা, এর সঙ্গে অন্ধবিশ্বাস গভীর সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। অনাদিকাল থেকে ভারতবর্ষ কৃষির জন্য প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। প্রকৃতি যদি রুষ্ঠ হয়, তাহলে খরা বা বন্যার মত বিনাশকারী পরিস্থিতির উপক্রম হয়। দীর্গ খরা বা অনাবৃষ্টি দূর করার জন্য বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে রাজবংশী সম্প্রদায় কোথাও ব্যাঙের বিয়ে বা কোথাও হুদুমা খেলা অনুষ্ঠিত হয়। হুদুমা খেলা লোকাচারটি পালনে কেবলমাত্র নারীরাই তার অধিকারিণী। বিশ্বাস ও সংস্কার পুস্তক রাজবংশী কৃষক সমাজ অন্যদৃষ্টি হাত থেকে নিজেদের কে বাঁচাতে বৃষ্টির দেবতা বরুণের শরণাপন্ন হয় এদের বিশ্বাস তাকে তুষ্ট করতে পারলে প্রকৃতির রোষানলের হাত থেকে তারা বাঁচতে পারবে। তাই বৃষ্টির কামনায় জলদেবতা বরুণ লোকায়ত ধর্মবিশ্বাসের হুদুম দেও নামে পরিচিত।[১৪] লোকাচারটি আনুষ্ঠানিকভাবে পালনের জন্য কল আকাশ মাটির ঘর আমার পল্লব দই চিড়া গুড় কলা ইত্যাদি উপকরণের দরকার হয়। এই অনুষ্ঠানের সবচেয়ে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য তা হল রাতের অন্ধকারে গৃহস্থ বাড়ির মহিলারা বিবস্ত্র হয়ে অনুষ্ঠানের যাবতীয় কাজ করে সেখানে পুরুষ একেবারে নিষিদ্ধ। হান্টার তার স্ট্যাটিসটিক্যাল একাউন্ট অফ বেঙ্গল এ হুদুম দেও খেলার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন—"A singular relic of old superstition is the worship of the God Hudum-Deo. The women of village assemble in some distant and solitary place, no male being allowed to be present..."[১৫]

পারিবারিক সংস্কৃতি :

উত্তরবঙ্গের লোকসমাজে প্রচলিত এবং বহুল জনপ্রিয় পারিবারিক লোকাচার

'সখাপাতা'। এই লোকাচারটির উৎস সম্বর্কে অজানা থাকলেও অনুমান করা হয়নি লোকাচারের মাধ্যমে রাজবংশী সমাজের মধ্যে রামায়ন-মহাভারতের অনুকরণে এর পথ চলা শুরু হয়েছিল। রামায়ণের যেমন রামচন্দ্র-বিভীষণ, মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, নির্মল ক্ষুদ্র স্বার্থ বিবর্জিত সর্বোপরি বৃহত্তর স্বার্থের লক্ষে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলার অনুপ্রেরণা রাজবংশীরা হয়তো এই পৌরাণিক কাহিনীগুলির মধ্যে নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের পথেয় করেছিলেন। সখাপাতা কথাটির অর্থ হল বন্ধু নির্বাচন।[১৬] বন্ধু নির্বাচন মানেই এই বন্ধু নিত্যদিনের পরিচিত বন্ধু নয়। চলার পথে সমবয়সীদের দেখা অল্পবিস্তর আলাপ এরমাধ্যমে একে অপরের কাছাকাছি চলে আসে বা বন্ধুত্ব হয়। তখনো কিন্তু এরা সখা নয়, রাজবংশী সম্প্রদায়ের আজকে বন্ধু'র উপরে সকালে স্থান দেওয়া য় কেননা এর মাধ্যমে শুধু দুইজনের আন্তরিকতা নয় দুটি পরিবারের পারিবারিক বন্ধুত্বের সম্পর্ক, যেখানে দুটি পরিবারকে সুখে দুঃখে দাঁড়ানোর এক অলিখিত ঘোষণাপত্র বলা যেতে পারে। তবে এ ক্ষেত্র বাধ্যবাধকতা নয় বরং অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে বিনয়ের সঙ্গে পালন করার বিষয়টিকে প্রস্ফুটিত করে। এই লোকাচার অনুষ্ঠানটি প্রাথমিক অবস্থায় দুই কিশোরের পরিবারমিলিত হয়। পারিবারিক অনুষ্ঠান টি সম্পন্ন করার জন্য তীর্থস্থান বা মেলাকে বেছে নেওয়া হয়। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলায় বেশকিছু 'বারুনীর'মেলা বসে। সাধারনত এগুলই চৈত্র মাসে এর পরেই অষ্টমীর মেলা। এই মেলা গুলিতে উত্তর বাহিনী নদীর জল (বুক সমান) দুইজন কিশোর নতুন বস্ত্র পরিধান করে, দুজনেই একজোড়া পান ও একজোড়া সুপারি বিনিময় করে এবং এর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। এই সম্পর্ক রক্তের সম্পর্কের ন্যায়। দুই কিশোরী পরস্পর বাবা-মাকে 'তাওয়াই' ও 'মাওই' বলে সম্মোধন করে এবং কিশোরের মা-বাবা পরস্পরকে 'সঙরা' এবং 'সুঙরি' বলে সম্মোধন করে। সখা পাতার লোকাচারের ন্যায় কোচবিহার শহর সন্নিহিত জলপাইগুড়ি জেলার কিছু অংশে দুয়ি দিনাজপুর জেলায় আরেকটি লোকাচার 'ভাদাভাড়ি' বা 'সইপাতা' বা সখিপাতা নামে পরিচিত। ভাদ্র মাসে লোকাচারটি সম্পন্ন হয় বলে এটি ভাদাভাড়ি নামেও পরিচিত।

অন্যদিকে রাজবংশী সম্প্রদায়ের সঙ্গে যে প্রকৃতির নিবিড় সম্পর্ক তার এক অনন্য নজির হল 'জিগা' (রাজবংশী ভাষায়) বা জিওল গাছকে লোকসংস্কৃতির সঙ্গে অন্তর্ভুক্তিকরণ থেকে। যে সমস্ত বিবাহিত মহিলার সন্তান জন্ম পরেই মারা যায়, বা পরপর দুই-তিনবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। ওই মহিলা তখন তার সন্তানের জীবন রক্ষার্থে জিগা গাছ বা জিওল (জীবন্ত) গাছের সঙ্গে সই বা সখি

(বন্ধুত্ব) পাতায়। কেননা জিগা গাছ হল অমর, যেকোনো পরিস্থিতিতে সে বেঁচে থাকে। তাই তাই অমরত্তের ছোঁয়া তার সন্তানের মধ্যে সঞ্চারিত করার এক অলীক কল্পনা করে। সৈকত আনার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ পরিবারের অন্য সদস্যরা করলেও বেশিরভাগ কাজ সংশ্লিষ্ট নারীকেই করতে হয়। ক্ষণজন্মা সন্তানের জননী তাকে নারী রূপে কল্পনা করে নতুন শাড়ী, শাঁখা, সিঁদুর পরিয়ে দেওয়া হয়। গাছের গোড়ায় পরিষ্কার লেখা মোছার পরে কলাপাতা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর দুধ, কলা বা অন্যান্য ফল মুখ ভর্তি করে দেওয়া হয় কোথাও আবার নারকেল সহ ঘট বসানো হয়। এই পূজার ব্রাহ্মণ নয় অনুষ্ঠান কারিনী মহিলা জিগার 'সই' মেনে নিজেই মনের বাসনা প্রকাশ করেন। লোকাচার মতে পূজা অর্চনা করে। আধুনিক প্রজন্মের কাছে এই লোকাচার হয়ত হাসির খোরাক হতে পারে কিন্তু একথা বাস্তব এই গাছের প্রতি লোকসমাজে কি অগাধ বিশ্বাস যখন প্রাধান্য পায় সেখানেই যুক্তি বা বাস্তবতা খড়কুটোর মতো উড়ে যেতে বাধ্য। পূজার পর ওই গাছটির দেখভালের দায়িত্ব ওই পরিবার করে, যেতে কেউ ওর ডাল কাটতে না পারে। উদাহরণ হল বট-পাখরির বিয়াও (বিবাহ)। নিঃসন্তান দম্পতি এই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে। হিন্দু ধর্ম অনুযায়ী মৃত্যুর পর পুত্রের পিন্ডদান এর মাধ্যমেই মুক্তি লাভের বাসনা থেকেই এই আচার। নিঃসন্তান দম্পতি বট-পাখরীর (পাকুর গাছ) বিয়াও এর ব্যবস্থা করে কোন এক শুভদিনে বট, পাকুড় গাছকে বর ও কনের প্রতীক স্বরূপ বিয়ে দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানের পর ওই গাছ দুটিকে বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা হয় যাতে কেউ ক্ষতি করতে না পারে।[১৭]

এই জাগতিক বিশ্বের সমস্ত কিছুই পরিবর্তনশীল। এই পরিপ্রেক্ষিতে কোন একটি সমাজ একিই জায়গায় স্থির থাকবে তা তো হতে পারে না। কবির ভাষায় চলমানতাই হল জীবন। কোন একটি সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি পরিবর্তনের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে দুটি শক্ত প্রথমতঃ দুটি সমাজ বা দুটি সংস্কৃতি যদি পরস্পরের কাছাকাছি চলে আসে তাহলে দুর্বল সংস্কৃতি, সবল সংস্কৃতির কাছে সে প্রতিনিয়তই কিছু গ্রহণ করতে থাকেন। দ্বিতীয়তঃ কোন একটি সম্প্রদায় সাংস্কৃতির দিক থেকে পরিবর্তিত হয় বা তা নির্ভর করে সেই সম্প্রদায়ের জ্ঞান-গারিমা ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্যক্তিগত আচার আচরণের উপর, যেখানে ব্যক্তির সমস্থি হল সমাজ।[১৮] পাশাপাশি একথা সত্যি যে সমাজ বা সম্প্রদায়ের যতটাই প্রাগ্রসর হোক না কেন তার স্বতন্ত্রতা কিন্তু ঐতিহ্য, পরম্পরা ও সংস্কৃতির মধ্যেই নিহিত থাকে।

সূত্রনির্দেশ :

1Ð Ghosh, Anadagopal: History of the name Uttar Banga and

North Bengal, edited book Shyamal Ch Sarkar, Changing society of 20th century Bengal, p-21-38.

২। ধনেশ্বর বর্মণ, উত্তরবঙ্গের জনজীবন ও লোকাচার, পৃ-১৮

৩। রুপ কুমার বর্মণ, উত্তরবঙ্গের ভূমিপুত্রদের সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচিতি, সম্পাদিত বই, পরিমল বর্মণ, লোক-উৎস, ইন্ডিয়ান ফোকলোর রিসার্চ জার্নাল, পৃ-৩০-৩৪

4Ð Oxford Dictionary, Oxford University press, New York 2008

৫। সাখাওয়াত হোসেন, বাংলার লোকসংস্কৃতি চর্চা, সোপান পাবলিকেশন কলকাতা, পৃ-২৫

৬। সব্যসাচী ভট্টাচার্য, ভারতে উপনিবেশিক শক্তি জনমানস, সম্পাদিত বই, রঞ্জিত সেন, সুস্নাত দাস ও আশিষ কুমার দাস, ইতিহাসের দিগদর্শন পশ্চিমবঙ্গ সংসদ,পৃ-২৪৭-২৫৫

7Ð Debojyoti Das, State-Science, Hegemony and Shifting Cultivatior, edi..book Sajal Nag. plaing With Nature, p-181-204.

৮। পরিমল বর্মণ : উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের লোক-প্রযুক্তি।

9Ð W.W.Hunter : A Statistical Report of Bengal, D.K.publishing Hous, New Delhi, p-383.

১০। পরিমল বর্মন, উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের লোক-প্রযুক্তি, পৃ-২০

11Ð W.W.Hunter : A Statistical Report of Bengal, D.K.publishing Hous, New Delhi, p-399.

১২। পরিমল বর্মন, উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের লোক-প্রযুক্তি, পৃ-৫১

১৩। নিখিলেশ রায়, পৌষের কাছাকাছি : সম্পাদিত বই, পরিমল বর্মণ, লোক-উৎস, পৃ-১১-১৮

১৪। ধনেশ্বর বর্মণ, উত্তরবঙ্গের জনজীবন ও লোকাচার, পৃ-১৪৫-১৫৬

15Ð W.W.Hunter : A Statistical Report of Bengal, D.K.publishing Hous, New Delhi, p-378.

১৬। ধনেশ্বর বর্মণ, উত্তরবঙ্গের জনজীবন ও লোকাচার, পৃ-৮০-৮১

১৭। রমেশ চন্দ্র বর্মণ, ঐতিহ্য দ্য ট্রাডিশন।

18Ð Manish Kr Raha, Matriliny to patriliny : A Study of Rabha Society, p-10-12.